দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ সামাজিক খাতে জাতীয় বাজেটের ২৪ শতাংশ হারে অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচির সফল সমাপ্তির পর ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)' শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর আলোকে স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর এ খাতে বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জিত হবে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2016 অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুসংহত অবস্থানে রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2016 অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম। বর্তমানে মানব উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকসমূহের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (০.৭৬৬), ভারত (০.৬২৪) এবং ভূটান (০.৬০৭) বাংলাদেশ (০.৫৭৯) অপেক্ষা এগিয়ে আছে। অপরদিকে, নেপাল (০.৫৫৮) এবং পাকিস্তান (০.৫৩৮) এর অবস্থান বাংলাদেশ অপেক্ষা নিচে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন দশকে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০০৫	২০০৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
সূচকের মান	০.৪৫৩	০.৪৯৪	০.৫১৫	০.৫৩৯	০.৫৪৯	০.৫৫৪	০.৫৫৮	০.৫৭০	০.৫৭৯

উৎসঃ Human Development Report, 2016. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট বাজেটের ২৪ শতাংশ। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন এবং প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখচিত্র ১২.১ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

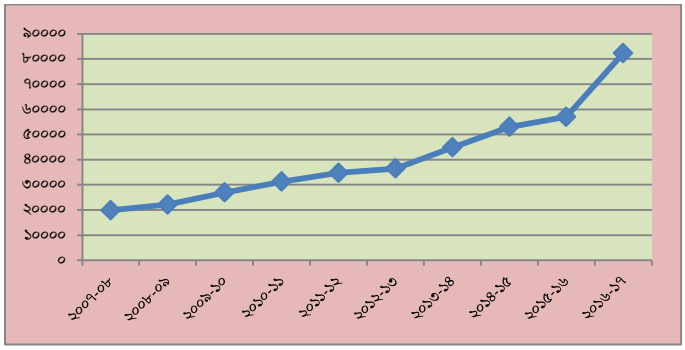

*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**১৯৮১৮**	**২২১২০**	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সৃজনশীল, কর্মমুখী, বিজ্ঞানধর্মী, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে

নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট ২১,৯৬২.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এ "Inclusive and equitable quality education and ensuring life long learning for all" এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি'-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার যুগান্তকারী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পসহ (৬৪ জেলা) আরও কিছু প্রকল্প। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১,২৬,৬১৫টি (ব্র্যাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৬ঃ ৫০.৪-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)	৮৭.২
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাকাল সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০০৭-২০১৫ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২

উৎসঃ Annual Primary School Census, 2015,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সারণি ১২.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে মোট ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২০.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬২.৬৭:৩৭.৩৩ ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরো গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "ইংলিশ ইন এ্যকশান" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮.০০ লক্ষ থেকে ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছিল। জুলাই ২০১৫ হতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত এবং নতুন ভাবে উন্নীত ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীসহ ১.৩০ কোটি সুবিধাভোগীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৩টি উপজেলার ৩০.০৫ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ২৫,৮৫৫টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে প্রায় ১,১৪,৭৫৫ জন শিক্ষককে সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত-

- পিইডিপি-৩ এর আওতায় ১০টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ১,৪১০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৮৩টি বিদ্যালয় বড় ধরণের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।

- ৪,০১১টি গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, ২,৯৫৯টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- পিটিআই বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলাসদরের মধ্যে ১১টি পিটিআই স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১,১৭৯ টি বিদ্যালয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৮টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও ২২৮টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান আছে।
- আইডিবি এর সহায়তায় নির্মিতব্য ১৭০টি বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান আছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৬ সালের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৮.৩১ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৮.৫১ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৫৭ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৮৫ শতাংশ। বিগত সময়ে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা উন্নীত করে প্রায় ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯.৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি অর্থাৎ প্রায় ৮২.৫ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

৫,৬৮৭.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্পের ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেয়া হচ্ছে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১১.২০ কোটি এবং ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১০.৫৩ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৩৩.২৮ লক্ষ বই এবং প্রায় ৬৯.৩০ লক্ষ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামীতে ১০০ শতাংশ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে। ২০১৭ সালেই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী) শিক্ষার্থীদের মাঝে ৮ ধরণের পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি

ইতোপূর্বে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ৫৯৫ ঘণ্টা এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য ৮৩৩ ঘণ্টা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় ৪ হাজার দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রুপান্তরিত করার ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণীতে ৯২১ ঘণ্টা এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ১,২৩১ ঘণ্টা দাঁড়িয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণির এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ঐ সংযোগ ঘণ্টা যথাক্রমে ৬০০ ঘণ্টা এবং ৭৯১ ঘণ্টা।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৬২.৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রথম পর্যায়ে ১৫,০০০ জন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৭,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরো প্রায় ১৫,০০০ সহকারী শিক্ষকসহ সর্বমোট ৩৪,৮৯৫জন নিয়োগ প্রদান করা

হয়েছে। এ ছাড়াও আরো প্রায় ১০,০০০ সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এরুপ ৬৬৭টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৫ জন করে সর্বমোট ৩,৩৩৫টি শিক্ষকের নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে, এ নিয়োগ কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের জন্য প্যানেলভুক্ত ৪২,৬১১ জন শিক্ষকদের মধ্য থেকে তিন ধাপে ৩৪,৩৭৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ১৪৮টি উপজেলায় ১,০৮৫.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২১,৩৬১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভুত কিংবা ঝরে পড়া শিশুরা ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। শিশুদেরকে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৮০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ১০০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম এর জন্য বছরে ৪০০ টাকা, ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তিকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে ভর্তি সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ২,০০০ টাকা সহায়তা পাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২,২২,০৮৫ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং ১,৪৩,৯৭৪ জন শিক্ষার্থী পাশ করেছে। পাশের গড় হার ৬৪.৮৩ শতাংশ। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২.৭৩ লক্ষ। ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশুদের জন্য সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সেকেন্ড চান্স বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলছে। দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর এবং দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ৭টি বিভাগের আওতায় ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। নিরক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনলাইন বদলী কার্যক্রমের সূচনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন ও আইসিটি সামগ্রী প্রদান, আইসিটি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের উন্নততর পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে ISAS Ranking এর ভিত্তিতে ক্যাটাগরি নির্ধারণ, পিবিএম ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমসমুহের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২৪,৪১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩,৫৪,৭২৯ জন শিক্ষক এবং ১,৩৪,২১,৯৪১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের ১,০২.৫৮ লক্ষ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১৭,৬৮.৩০ লক্ষ পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অনলাইনের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০,৩৪,৮৭৯ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ৮২,৫০০.৯০ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং ঝরে

পড়া রোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সভা-সমাবেশ, সচেতনতামুলক কর্মশালা এবং এসইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাওশি) আওতায় ২০০৯-২০১৬ সাল পর্যন্ত ৪০টি কলেজ এবং ২৭টি স্কুল জাতীয়করণ করা হয়েছে। মাউশির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ১,৪৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্লাস (ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান) গ্রহণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেকায়েপ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৫০টি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩,৩৫৪ জন (গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে) এসিটি শিক্ষক (অতিরিক্ত ক্লাশ শিক্ষক) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১,৯৮২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৪,৩৬,০৫৬টি বই সরবরাহ এবং পুরষ্কার হিসেবে ২৪,০৫,৬৭৪টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের মাধ্যমে ২৮৪টি মডেল বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও৪ টি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সিলেটে ২টি, বরিশালে ২টি ও খুলনা শহরে ৩টি সহ মোট ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/ প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরী বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজী কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৭,৯৪১টি যার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৫০৯টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৭,৪৩২টি। এছাড়া, কারিগরি সাবসেক্টরে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে এবং বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ২৩টি বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল (টিএস) স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্স (BITTTR) স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার বৃহত্তর কলেবর, যুগের চাহিদা, এর অধিকতর মানোন্নয়ন, সুষ্ঠু তদারকি, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে কেবল এমপিও ভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএর

মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasha Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার কর্তৃক একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে স্থাপিত নতুন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে পন্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে সরকার Cross Border Higher Education (CBHE)-2014 আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলাদেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement (HEQEP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা স্বরুপ Higher Education Management Information System (HEMIS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হেমিস পোর্টালের (ugc-hemis.gov.bd) মাধ্যমে অন-লাইনে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডাটা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হেমিস এ ১১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ডাটা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৬ সালের ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) এর অর্থায়নে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে ইউডিএল এর সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭। সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল এর মাধ্যমে ৩১,০০০ ই-বুকস ও ৩,১০০ ই-জার্নাল এর এক্সেস সুবিধা পাচ্ছেন। ইউডিএল এর ওয়েব পোর্টাল (udl-ugc.gov.bd) এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারীগণ

সরাসরি ই-রিসোর্স প্রোভাইডারদের পোর্টালে প্রবেশ করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে Trans Eurasia Information Networks (TEIN) এর সদস্যপদ ও অংশিদারত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের ৩৪টি পাবলিক ও ১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় TEIN এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জ্ঞানভান্ডারের সাথে যুক্ত হয়েছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP) এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের ই-লার্নিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ICT Learnning Center স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি কলেজে আইসিটি বিষয়ক ২৫৫টি প্রভাষক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (TQI-II) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়্যার এবং ট্রাবলশুটিং এবং এ্যাডভান্সড আইসিটি ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩টি বিষয়ে ই-ম্যানুয়েল (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) প্রণয়ন এবং ছয়টি বিষয়ে ই-লার্নিং (ইংরেজি, গণিত ও হিসাববিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ ও জীববিজ্ঞান) উপকরণ উন্নয়ন ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

TQI-II ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প-এর আওতায় ৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল (সিসিএস)/ ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার ৩১টি প্রতিষ্ঠানে উলম্ব সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন এবং বাকী ২০টি সিসিএস/সিসিএস কাম ই-লার্নিং সেন্টারের মধ্যে (আনুভুমিক সম্প্রসারণ) কাজ চলমান রয়েছে। এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২) প্রকল্পের অধীনে বৈদেশিক কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণে সরকারকে সহায়তা করার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে ৩১টি Digital Language Laboratory চালু করা হয়েছে।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যমান আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ কোটা হতে ২০ শতাংশ কোটায় উন্নীত করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে ১,০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বিগত ৪৫ বছরে স্বাস্থ্যখাতে প্রভূত উন্নতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের স্বাস্থ্য খাতের অর্জন আশাব্যঞ্জক। এই বছরে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নীচে নামানোর মাধ্যমে এমডিজি-৪ অর্জন এবং অন্যান্য সূচকসমূহ প্রত্যাশিত মাত্রায় হ্রাসের ফলশ্রুতিতে এ দেশ বিশ্বের মধ্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকারের বিবেচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেক্টর ওয়াইড কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন সহযোগী ও সরকার একসাথে স্বাস্থ্য সেক্টরের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে বিধায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, অর্থায়ন সকল ক্ষেত্রেই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া জবাবদিহিতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও সকল স্তরে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্টর ওয়াইড কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরকারি স্বাস্থ্য ¯¯া প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু

হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ও বেড়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
স্থূল জন্মহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	১৯.২	১৯.২	১৮.৯	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮
	শহর	১৭.১	১৭.৪	১৭.১	১৮.২	১৭.২	১৬.৫
	গ্রাম	২০.১	২০.২	২০.০	১৯.৩	১৯.৪	২০.৩
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	৫.৬	৫.৫	৫.৩	৫.৩	৫.২	৫.১
	শহর	৪.৯	৪.৮	৪.৬	৪.৬	৪.১	৪.৬
	গ্রাম	৫.৯	৫.৮	৫.৭	৫.৬	৫.৬	৫.৫
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৩.৯	২৩.৯	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৯	২৫.৩
	নারী	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৪	১৮.৩	১৮.৪
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৭৮৫	২৮৬০	২৮৬০	২৮৬০	২১২৯	২৬২৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৭.৭	৬৯.০	৬৯.৪	৭০.৪	৭০.৭	৭০.৯
	পুরুষ	৬৬.৬	৬৭.৯	৬৮.২	৬৮.৮	৬৯.১	৬৯.৪
	মহিলা	৬৮.৮	৭০.৩	৭০.৭	৭১.২	৭১.৬	৭২.০
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৬	৩৫	৩৩	৩১	৩০	২৯
	শহর	৩৫	৩২	৩১	২৬	২৬	২৮
	গ্রাম	৩৭	৩৬	৩৪	৩৪	৩১	২৯
শিশূ মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪৭	৪৪	৪২	৪১	৩৮	৩৬
	শহর	৪৪	৩৯	৩৭	৩৫	৩০	৩২
	গ্রাম	৪৮	৪৭	৪৪	৪৩	৪০	৩৯
মাতৃমৃত্যু হার (%)	জাতীয়	১.৯৪	২.০৯	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩	১.৮১
	শহর	১.৭৮	১.৯৬	১.৯০	১.৪৬	১.৮২	১.৬২
	গ্রাম	২.৩০	২.১৫	২.১০	২.১১	১.৯৬	১.৯১
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৬.৭	৫৮.৩	৬২.২	৬২.৪	৬২.২	৬২.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১২	২.১১	২.১২	২.১১	২.১১	২.১০

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2015

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)" শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২,০৩২.৩৬ কোটি টাকা যার মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১,৬৪৪.৬৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮০.৯২.%)।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্র সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা। HPNSDP কর্মসূচির আওতায় ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদি।

জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, "স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক (Health Nutrition & Population) জাতীয় নীতিমালা এবং HNP সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলের (Strategy) আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার ।াণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৭-২০২২ মেয়াদে "স্বাস্থ্য,

জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP)" শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) রূপান্তরের ক্রান্তিকালে আসন্ন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিটি শুরু হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর প্রধান ফোকাস ছিল স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। অপরদিকে এ খাতের বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জিত হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ সর্বনিম্ন পর্যায়ে সরকারি ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যা মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়। কিন্তু ২০০১-২০০৮ মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ২০০৯ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) 'Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য জেলা, হাওড় ও চরাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত ৩৬১টি সহ মোট ১৩,৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ কালে ১৩,৩৫২টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশিষ্ট ৫০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে জাইকার অর্থায়নে ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে দেশে ওয়ার্ড পর্যায়ে বসবাসকারী কম-বেশী ৬,০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য মোট ১৩,২৩৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে, যার মাধ্যমে বছরে ৬৬,৬০০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ৩০ ধরনের ঔষধ সরবরাহ করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বহিঃবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি সেবা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ, উচ্চতর পর্যায়ে রেফারেল সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন'এ' অভাব জনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসুচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশে Dengue, Swine Flu এবং SARS রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। DOTS কার্যক্রমের মাধ্যমে Smear Positive ফুসফুসের যক্ষা রোগ নির্ণয়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এ রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের হার ৯২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এছাড়া Child Health Programme, School Health Programme, Adoloscent Health Programme, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার HPNSDP কর্মসূচির আওতায় ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদেরকে রোগমুক্ত রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোক্কাল নিউমোনিয়া, রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপি ১৭৩ **য় টিকাপ্রাপ্তির হার**

বছর	বিসিজি (%)	ওপিডি-১ (%)	ওপিডি-২ (%)	ওপিডি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫	৯৫	৯৪	৯২	৯১	৯৩	৯২	৮৬	৮১
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪	৯১	৯৩	৯৩	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪	৯৫.১	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৯৩	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৩	৯৫.৮	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪	৯৪.৭	৯৪.১	৯১.৭	৮৬.৫

উৎসঃ Bangladesh EPI CES ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ,২০১৪, ২০১৫, ২০১৬

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

জাতীয় পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু, সিএসবিএদের প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এর প্রবর্তন, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এর আগাম সনাক্তকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলায় সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় ব্যাপক আকারে মাতৃ, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (MNCH) বাস্তবায়ন করছে। জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstretic Care (EmOC) চালু করেছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩টি সাধারণ হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬৩টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstretic Care (CEmOC) এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstretic Care (BEOC) সেবা চালু আছে। EmOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার মোট প্রসবের ০.১৭ শতাংশ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার মোট জীবিত জন্মের হার ২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দূর্গম ও প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্ট (সিএসবিএ) এবং মিডওয়াইফদের স্বল্পকালীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১১,৫৪৪ জন মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কে চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফারির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর আওতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে "ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)" শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো। দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Severe Acute Malnutrition (SAM) ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। জেলা সদর ও উপজেলা হাসপাতালে ২০০টি SAM Unit স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টিরোধ করার জন্য জেলা সদর ও উপজেলা হাসপাতালে ৩৯৫টি Integrated Management of Childhood Illness Programme (IMCI) এবং পুষ্টি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এনএনএস শহরের বস্তি এবং গ্রামের দূর্গম এলাকাসহ সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনগণের আচরণ পরিবর্তনে প্রচারণামূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম যথা শিশুর খাবার ও পুষ্টি বিষয়ক টিভি স্পট, মাল্টিমিডিয়া, উপজেলায় বিলবোর্ড স্থাপন, রেডিও স্পট ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

জাতীয় পুষ্টি নীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত, গেজেট আকারে প্রকাশিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ করা হয়েছে। যুগোপযোগী বিএমএস এ্যাক্ট

জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন এবং বিবিএফ এর মাধ্যমে ১,৯০০ ডাক্তার এবং ১,১১০ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নির্ভর ডায়েটারী গাইডলাইন প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। অপুষ্টির ঘাটতি ও নিরাময় কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ (%)	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	৩৩%	অর্জিত
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২			৩৮%	অর্জিত
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪			-	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	-	২৩**	১২%	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫৭	-	চলমান
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	এক-তৃতীয়াশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২	<১%	অর্জিত
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	-	৮২	-	এক-তৃতীয়াশ হ্রাস	চলমান
শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫	৫০%	অর্জিত
শিশুদের পরিপূরক খাবার গ্রহণের হার	৭৪	৬৭	৬৯.৭	৬৫%	অর্জিত
গভর্বতী মায়েদের বাড়তি খাবারের হার	-	-	-	৭৫%	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৯২*	৯০%	অর্জিত

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্যবীমা

স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage-UHC) অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার তিনটি উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)' নামে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। পাইলটের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদা— মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি রো আন্ত:বিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অন্যতম একটি কর্মকৌশল হলো দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল শ্রেণির জনগণকে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির আওতায় আনা। সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা চালুর মাধ্যমে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৫ (Health Protection Act 2015) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের ল্যাপটপ এবং এন্ড্রয়েড ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার —র্ক্রম এগিয়ে চলছে। প্রতিটি নাগরিককে একটি অভিন্ন :alth Identifier Code' প্রদান করা হচ্ছে যা জাতীয়

পরিচয়পত্রের ডাটা বেজ এর সাথে সংযুক্ত করে স্থায়ী স্বাস্থ্য বিবরণী তৈরির সফটওয়্যার ডিজাইনে ব্যবহার করা হবে। জাতীয় ই-হেলথ পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজীর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তি কার্যক্রম, স্বাস্থ্য খাতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ডাক্তারদের ছুটি ও ডেপুটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, সকল ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ এর মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ৮০০ সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ প্রদান বা স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। ৪২টি হাসপাতাল থেকে উন্নত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে নাগরিকদের অনলাইনে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটি সার্বক্ষণিক কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি "Skype Based Teleconsultation" চালু হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার বিবেচনায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। মোট প্রজনন হার (TFR) ২.৭ থেকে ২.৩ এ নামিয়ে আনা হয়েছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বেড়েছে। এই সাফল্য অব্যাহত রাখার জন্য International Conference on Population and Development (ICPD) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ সরকার 'জনসংখ্যা নীতি' প্রণয়ন করেছে। ২০২২ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের মোট প্রজনন হার ২.৩ থেকে ২.০০ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬২.৪ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিগ্রহীতা বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ এবং দেরীতে প্রথম সন্তান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে জন্ম প্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে (১৯৭৫ সালে ৮% থেকে ২০১৪ সালে ৬২%)। তবে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি ব্যবহারের হার এখনও কম (৮%)। এইচপিএনএসডিপি কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা সামগ্রিকভাবে জন্মপ্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহার ৭২ শতাংশে উন্নীত করা। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৯টি ইউনিট এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

বর্তমানে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে EOC সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অদ্যাবধি ৩২৩ জন চিকিৎসককে এক বছর মেয়াদি এবং ৬৯২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ৬ মাস ব্যাপী ওটি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ারের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১,৭৯৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে আর ৮০ জন প্রশিক্ষণাধীন রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার জন্য ৯,৯৬৭ জনকে পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের এমআর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যা মাতৃ মৃত্যু ও অনিরাপদ গর্ভপাত কমানোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাঠ পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ ইপিআই ও এনআইডি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ে ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের MCH-FP ইউনিট, ৩,২৯৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১২,৫৭৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক, এবং প্রতিমাসে সংগঠিত প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে ১২টি উপজেলায় এবং ২৪টি ইউনিয়নসহ দেশব্যাপী সর্বমোট ৯৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ২৪/৭ জরুরি প্রসূতি সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। রি প্রসূতিসেবাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার স্থানীয় জনগণের চাহিদার আলোকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আরও নতুন ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWCs) নির্মাণ

করেছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত দেশের সকল জেলায় পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ৮টি জেলায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আসন্ন ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে (২০১৭-২০২২) অবশিষ্ট সকল জেলায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে, পিপিপি-র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিস এন্ড ইউরোলজি) কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার এর কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত আছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা ১১,৫৬৬ এ উন্নীত করা হয়েছে। দেশে সরকারি পর্যায়ে মোট ৩৬টি মেডিকেল কলেজ (৩,৮১২ আসন), ৯টি ডেন্টাল কলেজ (৫৩২ আসন), ২৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন (১,৫৯২ আসন), ৮টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল (৭১৬ আসন), ৮টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি (২,১৭১ আসন), এবং ১৪টি নার্সিং কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৬৮টি মেডিকেল কলেজ (৬,১৬৫ আসন), ২ ডেন্টাল কলেজ (১,৩৫৫ আসন), ১০টি পোস্ট গ্র্যাজু... ইনস্টিটিউশন (১৬৯ আসন), ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল (১৩,৫৪০ আসন), ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি এবং ২৪টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধাতালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে।

নার্সিং সেবা

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সেবা অধিদপ্তর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে। দেশে বর্তমানে ৪১,৯০১ জন রেজিস্টার্ড নার্স-মিডওয়াইফ রয়েছে। দেশে বিদ্যমান ৪৩টি সরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউটের আসন সংখ্যা ১,৫৮০ থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫৮০ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৯,৫৯৮ জন রেজিস্টার্ড নার্স নিয়োগের ফলে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজিত ৩১,০৬৮টি পদের মধ্যে মোট ২৭,৫৮০টি পদে রেজিস্টার্ড নার্স কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রাক্তন ৭টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে এবং দিনাজপুরে নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং ফিলিপাইন ও দেশের অভ্যন্তরে বিষয় ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি বিশেষায়িত কোর্স চালু করা হয়েছে। নার্সিংএ স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর ডিগ্রীর সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নার্সিং পেশায় মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় ২টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে মিডওয়াইফারী কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ৪২১টি থানা হেলথ কমপ্লেক্স এবং ১,৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারে মোট ২,৯৯৬টি মিডওয়াইফের পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বমোট ১,২০০টি পদে সার্টিফাইড মিডওয়াইফ পদায়ন করা হয়েছে। ৩৮টি (১০টি নার্সিং কলেজ এবং ২৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট) নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩-বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৯৭৫-এ উন্নীত করা ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১,৪৮৪ জন রেজিস্টার্ড কে ৬ মাস মেয়াদি সার্টিফাইড এ্যাডভান্সড ও মিডওয়াইফারী কোর্স প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ও জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২ সরকারের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। Bangladesh Health Workforce Strategy 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কৌশল (Health Financing Strategy) চূড়ান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন-মেডিকেল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়োগ সংক্রান্ত recruitment rule আপডেট করা হয়েছে। জাতীয় পুষ্টিনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ করণ আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Drug Information এবং Adverse Drug Reactions Monitoring Cell স্থাপন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ড্রাগ ও ভ্যাকসিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং ফুড কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে ই-হেলথ সেবা চালু করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দূর্গম এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রন কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্যাকেজ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলস্রোত ধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে আত্ম কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভ থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের পারস্পারিক ক্রিয়ামূলক যত্ন নিশ্চিতকরণসহ শিশু বিকাশের অনুকূল নিরাপদ পরিবেশ, বাড়ি, কমিউনিটি ও শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, ভাষাগত ও আবেগিক বিকাশ সাধনপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। এন্যাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক মূল্যবোধসমূহ সমুন্নত রেখে সুশীল সমাজ ও সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কৌশলগত সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সমাজে শিশু নিপীড়ন, নির্যাতন, সহিংসতা ও শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সারা দেশে নির্বাচিত ২০টি জেলায় ৪০,০০০ শিশুর মধ্যে ২,০০০ টাকা হিসাবে ১৮ মাসব্যাপী ক্যাশ ট্রান্সফার কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া, দেশে নির্বাচিত ২০ টি জেলায় ১৫,০০০ জন কিশোর-কিশোরী (বয়স ১৪-১৮) এর মধ্যে প্রত্যেককে এককালীন

১৫,০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর ৪২টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। শিশু বিকাশের প্রারম্ভিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিকেন্দ্রে ৩০ জন (৪-৫বয়সী শিশু) করে ২,১০৯ কেন্দ্রে Early Leaning Facilities এর মাধ্যমে শিশু বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয়। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ৫১টি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য একটি মাসিক ''শিশু'' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়া ৫ খন্ডে ''শিশু বিশ্বকোষ'' প্রকাশ করা হয়েছে। বছরে প্রায় ৪ লাখ শিশু লাইব্রেরীতে বই পড়ার সুযোগ লাভ করে এবং লাইব্রেরীভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১,২০,০০০ হাজার শিশু অংশগহণ করে। সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭০০ জন দুস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সমাজকল্যাণ

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমানে সরকার সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীর এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাত শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, দু:স্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবাদানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২,১৮,৩৮৪ জন গরীব রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থা

শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৩২০ জন। এছাড়াও 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩০,৫৯০ জন পথশিশুকে Drop In Center এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু আইন, ২০১৩ এর ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৬৫ জন। সেফ হোম এর মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ৪,৩৩৬ জন। দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৯,০১৫ জন। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মচারিসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি দেশের যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫০,৪৮,৭২০ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষিত এসব যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২০,৩৮,৭৫৯ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের মাত্রা ৩,১২,৫০০ জন এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

২,১০,৩৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৫৬,৫৯৪ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে "ন্যাশনাল সার্ভিস" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। "ন্যাশনাল সার্ভিস" কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে কর্মসূচির পাইলট এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার মোট ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ১৭টি জেলার ১৭টি দরিদ্রতম উপজেলায় এবং চতুর্থ পর্যায়ে দেশের ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চম পর্যায়ে দেশের ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় কর্মসূচির সম্প্রসারণ কাজ চলছে। এ কর্মসূচির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১,১৩,৯৫৯ জন যুবক/যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে মোট ১,১১,৬২৫ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ১,৫২,০৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ২,৭৮৫ জনকে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুবকেন্দ্র মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৭,৮৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুবকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৬,৫৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সমূহের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে ভূমিকা, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারী ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ২,৬৯,০০০ জন ছেলেমেয়ে ক্রীড়া কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য তাদের অনুকূলে বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে।

দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। পাহাড়পুর বিহার, মহাস্থানগড়, কান্তজিউ' মন্দির, ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সাইটসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এর ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি উল্লিখিত কায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। সুনামগঞ্জ জেলায় মগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে।

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। আটটি জেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কাজ চলছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মেরামত ও সংস্কার কাজ, ৬টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের কাজ চলছে।

বেসরকারি সংস্থা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে পাঠদান সেবামূলক কার্যক্রম ও এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা, পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণির পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ করছে।